কবি আলোক সরকারের মুখোমুখি

ঝর্ণা বর্মণ

প্রশ্নোত্তরের গভীরের যাবার আগে কবির প্রাথমিক পরিচয় টুকু নেওয়া যাকঃ জন্ম ২৩মার্চ, ১৯৩১ কলকাতার কালীঘাটে, আদি বাড়ি - সরিষা, ডায়মণ্ড হারবার ২৪ পরগণা। পিতা- মাতা— শচীন্দ্রনাথ ও কনকলতা সরকার। শিক্ষা - ১৯৪৭ এ ম্যাট্রিকুলেশন তীর্থপতি ইন্সটিটিউসন থেকে, গ্র্যাজুয়েশন ৫১ আশুতোষ কলেজ থেকে, এম.এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ -এ জীবিকা অধ্যাপনা, বিবাহ ১৯৬৮-এ। কাব্যগ্রন্থঃ —(১) উতল নির্জন (১৯৫০) (২) আলোকিত সমন্বয় (৫৭), (৩) অন্ধকার উৎসব (৬২), (৪) বিশুদ্ধ অরণ্য (৬৮), (৫) শ্রেষ্ঠ কতিা (৭২), (৬) অমূল সম্ভব রাত্রি' ৭৬ (৭) নিশীথ বৃক্ষ' ৮২, (৮) রৌদ্রময় অনুপস্থিত '৮৫, (৯) তমো শঙ্খ '৯০, (১০) প্রবহমান সাহিত্য (প্রবন্ধ), (১১) ভিনদেশী ফুল (অনুবাদ)- (আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে '৫৫)।

১। কবে থেকে লেখা শুরু করেন ? আপনার কবিতার প্রেরণা কি? নিজের কাব্যজগতের স্তরবিন্যাস বা ধারাবদল সম্পর্কে আপনার নিজের কি মত? আপনার কাব্য জগতে প্রবেশের সময়ের কবিদের সঙ্গে এখনকার কবিদের মূলগত কোন পার্থক্য আছে কিনা—

❖ সাত-আট বছর বয়স থেকেই সাহিত্য জীবনের শুরু। প্রথমে একটি ছোটোখাটো উপন্যাস রচনা করি, সেটা ১৯৩৮ সালের ঘটনা, কবিতা রচনা বিষয়ে আগ্রহ তার কিছুদিন পরের ঘটনা।

মা পদ্য রচনা করতেন। ভক্ত ছিলেন রবিবাবু আর ডি. এল. রায়ের কবিতার। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই খুব ছোটবেলায় হাতের কাছে পাওয়া তাই সহজেই সম্ভব হয়েছিল। মার চাইতেও বেশী ক'রে বলতে হবে অগ্রজ অরুণকুমার সরকারের কথা। অরুণ কুমারের আদর্শই আমার প্রেরণা, আমার উদ্দীপনা। এর পাশাপাশি একটা ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিশ্চয়। খুব নিঃসঙ্গ আর বেদনাতুর ব্যক্তিগত জীবন এবং সেখানে এমন একজন ঈশ্বর ছিলেন যিনি পথের প্রায় প্রতিটি ধূলিকণাতেই এক অলৌকিক এবং সংযোজিত রঙিনতা জ্বালাতেন।

কবিতার ইতিহাস তার বিন্যাসের ইতিহাস, প্রাজ্ঞজনের এই উক্তির মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে। আমার ব্যক্তিগত কবিতার ইতিহাস, আমি বলব, বহু বিচিত্র বর্ণের ইতিহাস। জীবনের এক একটি অংশে আমি এক ধরণের রঙের ভিতর বাস করেছি। আমার কবিতা সেই রঙিন হয়েছে। এক রঙের পর দ্বিতীয় রঙ— রঙের কি শেষ আছে আরো কত রঙ আছে যা এখনও আমার কবিতায় বেজে উঠল না।

সব দেশে সব কালেই অস্যখ্যা মানুষ কবিতা রচনার চেষ্টা করেন, তাদের ভিতর কবি হয়ে ওঠেন আর কজন! যে দু-একজন হন তারা নিশ্চয় এক আঁধার সাধনার পথ ধরে অগ্রসর হন। একাল সেকাল, আমাদের সময়, পরবর্তী সময়ের প্রশ্ন ওঠে না। তবু বাস্তব পটভূমির একটা তফাত আছে বৈকি। আমাদের সময় বেশির ভাগ পত্রিকাই ছিল বড় পত্রিকা। ছোট পত্রিকা Little Magazine প্রায় ছিলই না। ওই বুদ্ধদেব বসুর কবিতা' পত্রিকা আর শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক'। বড়ো পত্রিকা গুলিও অবশ্য কবিতা প্রকাশ করত কিন্তু অল্প। এখন অসংখ্য ছোট পত্রিকা, তার অনেকগুলিই কেবল কবিতা বিষয়ক। কবিতা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া এখন সহজ, আমাদের সময় তা অত সহজ ছিল না। এখন কবি সম্মেলন, কবিতা পাঠের আসর, কবিতার আবৃত্তি এই সব খুব সাধারণ সংবাদ। আমাদের কবিতা রচনার শুরুর সময় এই রকম কোনো রীতিই ছিল না। সেই সময় কবিতার পাঠক ছিল অল্প। যারা ছিলেন তারা অবশ্যই দীক্ষিত পাঠক; সেই সময় কবিতার বইয়ের বিক্রি ছিল খুবই কম, কেবল যথার্থ কাব্যরসিক ব্যক্তিরাই কবিতার বইয়ের ক্রেতা ছিলেন। আমরা যখন কবিতা লেখা শুরু করি তখন প্রকাশক কবিতার বই প্রকাশ করেছেন এটা ছিল একটা বড় সংবাদ। ১৯৮৪ -এ বিষ্ণু দে নিজের টাকাতেই 'অন্বিষ্ট' প্রকাশ করেছেন। এখন তেমন করিৎকর্মা কবি তার প্রথম কাব্য পুস্তকের জন্যই প্রকাশ পান। এখন কবিতার বইয়ের বিক্রি বেড়েছে কবিতার বই প্রকাশ লাভজনক হয়েছে কিন্তু বাঙলা কবিতার স্বাস্থের পক্ষে শুভ কি না এ নিয়ে একটা তর্ক থাকতে পারে বলেই মনে হয়।

২। আমরা জানি আপনি মুখ্যতঃ কবি। অন্য লেখাও অনেক লিখেছেন। কবিতার পরে আপনার কী লিখতে ভালো লাগে? আপনার ক'থম কবিতা কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়?

❖ কবিতির পরেই ভালো লাগে উপন্যাসে আর ছোট গল্প রচনা করতে। কিন্তু উপন্যাস বা ছোটগল্প বাণিজ্যিক পত্রিকার সহযোগিতা এবং স্বীকৃতি না পেলে প্রকাশ করা শক্ত। বিশেষ ক'রে আমি যা লিখতে চাই তার বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ যখন সামান্যতম নেই। একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সঞ্জন ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকায়। আর একটি কিশোর উপন্যাস 'আনন্দমেলা'য়।

আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' নামের পত্রিকায় ১৯৪৭ সালে।

৩। কাব্য নাট্যের চর্চা আমাদের সাহিত্যে এক নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। তাতে আপনার অবদান অনেকখানি। সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি— আধুনিক কাব্যনাট্যের সঙ্গে সুদূর অতীতের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও নিকট অতীতের কবিগান, ঝুমর প্রভৃতির ক্ষীণতম যোগ আছে কি?

❖ কাব্যনাট্যক সম্পূর্ণতই আধুনিক মনসঞ্জাত। তার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের কোনো ধারারই সম্পর্ক স্থাপন করা শক্ত। কাব্যনাটকের দ্বন্দ্ব আধুনিক মননশীল প্রক্ষোভের পটভূমিকে আশ্রয় করে। তা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিচিহ্নিত। প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত সাকল্যিক মানুষের কাহিনী, মানুষ এবং সমাজ, মানুষ এবং পরিবেশ।

৪। অনুবাদ করেছেন। রিল্‌কে কালিদাস ব্যতীত অন্য কিছু? কিছুদিন আগে অনুবাদ বিষয়ে একটা সর্বভারতীয় সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন— আপনার কি মনে হয় সাহিত্যের এই বিভাগটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল?

❖ কত যে অনুবাদ করেছি তার হিসেব নিকেশ নেই। ইউরোপের সব ভাষার কবিদের কবিতা তো বটেই, আমেরিকার, আফ্রিকার কবিদের কবিতাও বাদ দিই নি। ভারতীয় নানা ভাষার কবিতাও কম অনুবাদ করিনি, তবে গদ্য বেশী নয় অনুবাদ বিষয়ে আমার আদর্শ মূল রচনার কাছে যথাসাধ্য সমর্পণ। অনুবাদ দ্বিতীয় সৃষ্টি ইত্যাদি কথা আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। মূল রচনার সামান্যতম বিকৃতিও একটা পাপকর্ম।

পৃথিবীর সব দেশের ভাষা আমার জানা নেই, অনেকের জানা নেই। অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া ছাড়া তাই আর উপায় কি! তিনি যেন আমায় প্রতারণা না করেন! বলাবাহুল্য সাহিত্যের এই বিভাগটি বিশেষ মূল্যবান, তা কে বিশে, দেশের মানুষের বিশ্বজগতের বাসিন্দা করে তোলে।

অনুবাদ বিষয়ে একটা মোটামুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ গদ্যগ্রন্থ 'প্রবহমান সাহিত্যে' আছে। কৌতূহলী পাঠক প্রয়োজন বোধ করলে দেখতে পারেন।

প্রসঙ্গত ১৯৫৫ সালে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ফরাসী দেশের প্রেমের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলুম - মোট ষোলটি কবিতা ছিল — আটটির অনুবাদর আমি, আটটির অলোকরঞ্জন।

৫। আপনার কবিতার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে আপনার নিজের কি মনে হয়? আপনি নিজেকে কি রোমান্টিক ভাবেন? রোমান্টিকতার ব্যাপারে আপনার কি কোন পৃথক দর্শন আছে?

❖ কবিতার আলোচনায় 'দুর্বোধ্যতা' শব্দটি একান্তই অপ্রাসঙ্গিক যেহেতু কবিতা কোনকিছুই বোধ্য করতে চায় না, বোধ্য করা কবিতার ধর্ম নয়। 'কবিতা কিছু বলে না, বেজে ওঠে' রবীন্দ্রনাথের উক্তি। 'কবিতা শব্দ দিয়ে রচিত হয় idea ভাব-বিষয় দিয়ে নয়' - মালার্মে আমাদের জানিয়েছেন। 'রস অলৌকিক', সেই অলৌকিককে লৌকিকঅর্থে পাওয়ার চেষ্টাই পণ্ডশ্রম। তবু এই অলৌকিককে পাওয়ার সাধনায় লৌকিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আমাদের যেতে হয়। কবিতার বাক বিন্যাস যুক্তিসহ পারস্পর্যকে অবশ্যই মান্য করবে। কবিতার তাৎক্ষণিক আপাত এক অর্থ অবশ্যই স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হবে, যত হবে তত ভালো। সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন মালার্মের কাব্যদর্শই তাঁর অবিষ্ট, সেই মালার্মে যিনি ভাবময় অর্থাৎ অমূর্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অভিসারী ছিলেন। আমরা জানি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কতটা বিন্যস্ত, স্বচ্ছ, শৃঙ্খল রপায়ণ। 'কবিতা কিছু বলে না, বেজে ওঠে' —যতটা সত্য, কবিতা কিছু বলার ভিতর দিয়ে বেজে ওঠে, উত্তীর্ণ হয় ভাবময় অলৌকিক জগতে ততটা সত্য। আমার কবিতা সাধ্য মতো এই সব কথা মনে রাখে।

একটি দু'টি বাগ্যের ভিতর দিয়ে রোমান্টিকতার তাৎপর্য বোঝান সম্ভব নয়। অন্তত আমার পক্ষে। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতার পাশাপাশি ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের একটা বিশে, চরিত্র তাদের কল্পনা প্রবণতা, কল্পনার উপর তাদের বিশেষ গুরুত্বপ্রদান এবং কল্পনাকে এক বিশে, তাৎপর্যে গ্রহণ করা। আমার কাছেও এই কল্পনা কবিতা রচনা প্রয়োজনে বিশেষ মূল্যবান। রোম্যান্টিকতা বিশে, আমি অনেক কিছু ভেবেছি, তা পরিষ্কার করে বলতে একটি পুস্তক রচনা প্রয়োজন। সংক্ষেপে জানাই কল্পনা বলতে আমি এক নির্মিত সৃজন কর্মকেই বুঝি, যা সব থাকার সমাহারে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবময় না থাকা। শিল্পের সাধনা মিথ্যার সাধনা— এই উক্তির ভিতরেও কল্পনার সেই জাদুকরী শক্তির কথা আছে। বিবিধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এক দ্বিতীয় ভবন রচনা করতে সক্ষম।

আমার ধারণা ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কোন দর্শনের প্রভাব আমার কবিতায় নেই। এক নিত্য অমঙ্গলের বোধ আমার ভিতর আজীবন কাজ করেছে, আর আমার সংগ্রাম তাকে অস্বীকার করা। ভারতীয় বা পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে - আমি সবার কাছেই আশ্রয় খুঁজেছি এবং শেষ পর্যন্ত জেনেছি আবহমান সময় ব্যাপ্ত করা এক বর্তমানকে, অন্তত বর্তমানকে, কেবল বর্তমান, বর্তমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬। 'শতভিষা' সম্পাদনা করতেন— দীর্ঘদিন তা করেও ছিলেন। ছাড়লেন কেন?

❖ দীপঙ্কর দাশগুপ্তের সঙ্গে 'শতভিষা' কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করি ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ অবধি। সম্পাদনার কাজ থেকে আমরা যে সরে দাঁড়ালুম তার প্রধান কারণ — দায়িত্ব পালনের মতো সময় এবং সামর্থ্য আমাদের আর ছিল না। তাছাড়া সব কাজ থেকে একটা অবসর নেওয়ার সময় থাকা উচিত। সব চলারই একটা অবসান। প্রকৃতির এই নিয়মকে অমান্য করলে, যে অসম্ভাবী পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়, বিশ্বচেতনার ভিতর থেকে তার প্রতিবাদ বেজে ওঠে।

৭। 'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পর্কে ধারণা কী? 'লিটল ম্যাগাজিন' কি কোনদিন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে সমান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

❖ লিটল ম্যাগাজিন অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা তার কোন বাণিজ্যিক অভিলাশ নেই। লিটল ম্যাগাজিনের অবশ্যই বিশে, কোনো মনোভঙ্গী বা attitude থাকবে, এবং সেই মনোভঙ্গী, দৃষ্টিকোণ বা প্রতিন্যাসের প্রচলিত ভাব-ভাবনার জগতের পাশাপাশি নিশ্চয়ই একটা স্বতন্ত্র উচ্চারণ অত্যাবস্যক। তরুণ লেখক অথবা নবীন পণ্ডিতদের উৎসাহদান তার কোনো কর্তব্যই হতে পারে না, যদি না সেই তরুণ লেখক, নবীন পণ্ডিত কোন বিশেষ জাগরণের কেন্দ্রে উদ্দীপ্ত হয়।

প্রতিষ্ঠিত বলতে সম্ভবত আপনি বাণিজ্যিক পত্র - পত্রিকাগুলির কথাই বলছেন। এই বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির একমাত্র লক্ষ্য অর্থনৈতিক সাফল্য। যত পাঠক অর্থাৎ ক্রেতা বাড়বে তারা ততই উৎফুল্ল ক্রেতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন বেশি আসবে, বাড়বে বিজ্ঞাপনের দরও। এই বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির তাই রসিক অরসিকের জাত বিচার করে না। Philistine, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন অশিক্ষিত পাঠকদের সম্বন্ধে তাদের বেশি উৎসাহ, কারণ তারাই সংখ্যায় বেশি। তারা একান্তভাবে চেষ্টা করবে এই অমার্জিত, মূর্খ ব্যক্তিদের খুশি করবার — সাহিত্য তাদের কাছে কোনো প্রশ্ন নয়, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অবান্তর

প্রসঙ্গ, অর্থই পরমার্থ। সুতরাং এইসব বাণিজ্যিক পত্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্ঠাবান লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি আলোচনার কোন প্রশড়ই উঠতে পারে না। লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিজের ধর্ণে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, তার মন্ত্র তার ব্যক্তিগত মন্ত্র। তার সার্থকতা ও তার ব্যক্তিগত অর্থে সার্থকতা।

৮। তখনকার কবিতা পাঠক আর এখনকার পাঠক সম্পর্কে কিছু বলুন।

❖ পঞ্চাশ দশক থেকে দেশজুড়ে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর নতুন শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছে, উঠেছে, যাদের পরিবারে সংস্কৃতিগত কোনো ঐতিহ্য নেই, সাহিত্য পাঠের কোনো ধারা নেই। আজকের সাহিত্য পাঠকের অধিকাংশই এক নতুন শিক্ষিত সমাজ থেকে আসছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে এটা টের পাওয়া গিয়েছিল। এই নতুন শিক্ষিত সমাজই আস্তে আস্তে সাহিত্যের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠল, ফলত এদের রুচিই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল সাহিত্যের মান, প্রকরণ! ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সাহিত্যিকদের ভাবতেই হয় এদের তৃপ্ত করার কথা, কারণ এরাই অর্থ দেয়। প্রকাশকেরা এবং বড় বড় কাগজের সম্পাদকের কাছেও এদের মন জোগানো অত্যাবশ্যক। তারা তাই সেই সমস্ত লেখকদেরই উৎসাহ দেন যারা এই 'অসংস্কৃত' নতুন শিক্ষিত সমাজকে খুশী করতে পারে।

সাহিত্যের বাজার এখন বেশ সতেজ। প্রকাশক প্রচুর লাভ করেন, লেখকও প্রচুর টাকা পান। সাহিত্য এখন ব্যবসা। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সাহিত্যের মান যেমন নামছে, নিম্নমানের বোধ বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে সাহিত্যিক যেমন নীচু স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন তার রচনাকে, মহৎ সাহিত্য প্রচেষ্টাও কমে আসছে।

আগেকার দিকে সাহিত্যের পাঠক বেশী ছিল না। নিদারুণ অর্থকষ্টে সাহিত্যিকের দিন কাটছে এমন কাহিনী আমরা অনেক শুনেছি তবু সাহিত্য পাঠকের অধিকাংশ যেতে দীক্ষিত সংস্কৃত পাঠক ছিলেন, সাহিত্যকেও একটা মানের কথা ভাবতে হ'ত। পাঠক নিজেকে তৈরী করত, সাহিত্যিকও জানত সাহিত্য রচনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন, সবার উররে মানস উৎকর্ষের প্রয়োজন।

সবশেষে বলি, আমরা যখন কবিতা রচনা শুরু করি তখন অধিকাংশ পাঠকই পাঠক হবার যোগ্যতা অর্জন করে কবিতা পড়তেন, এখন অনেক পাঠকই আছেন যাঁরা নিজেদের কবিতা পাটের যোগ্য না করেই কবিতাতার সমঝদার হ'তে চাইছেন, সেটা আশঙ্কার।

৯। সাহিত্য চর্চায় 'গোষ্ঠী'র প্রয়োজন আমি কোনদিন অনুভব করি নি। যে কোনো সৃষ্টির প্রস্তুতি অন্ধকারে, সংগোপনেন — জননী - জঠরে সন্তান বড় হয়, মাটির আঁধারে বীজ। শিল্পরচনা একান্ত ব্যক্তিগত কাজ খুব গোপন, খুব নির্জন সেই তিমিরতীর্থ। গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রশ্ন সেখানেই ওঠেই না।

১০। ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের মধ্যে কোন অন্তরায় কখনো আপনি বোধ করেছেন? পেশা আপনাকে পিষে ফেলেছে কি?

❖ আমার জীবনের সঙ্গে আমার কবিতার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কবিতা রচনা করি— বিবিধ অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার বিন্যাস, কল্পনার সংযোজন, শব্দ ছন্দের সচেতন ব্যবহারে এমন একটা বস্তু যা লৌকিক পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে অলৌকিক। সুীন্দ্রনাথের মতো আমিও মনে করি আবেগ কবিতার জন্মশত্রু এবং আবেগকে বিসর্জন দিয়ে আমি অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেছি, আরো বেশী বিবিধ অভিজ্ঞতায় বিশ্লেষণী সচেতন বিন্যস্ত সমাহারে। নিরাসক্ত নির্লিপ্ত একজন কবির অত্যাবশ্যক চরিত্র — ব্যক্তিজীবনকে আমি নিরাসক্ত উদাসীনতায় দূরে সরে এসে বুঝে নিতে চাই, বিশ্লেষণ করি, চিরে চিরে দেখি, চরম শোককেও যেমন তেমনি পরম আনন্দকেও। খুব নিষ্ঠুর এই খেলা। আমার পেশাকেও যেমন আমি দূরে দাঁড়িয়ে বুঝে নিতে চাই, প্রয়োজনে ব্যবহার করি শিল্পউপকরণ হিসেবে, ঠিক সেইরকম আমার ভালোাসাগুলিকেও। জীবনে সত্যি কারুকে ভালোবেসেছি কিনা আমি জানি না, সত্যি কারুকে ঘৃণা করেছি কিনা তাও জানি না। শত্রু মিত্র সকলেই শেষ পর্যন্ত শিল্পউপকরণ, যেমন ওই গাছ, ওই ধূসর পথ, শরতের অমল - ধবল মেঘ।

১১। বর্তমান সমাজকে কবিরা কি কিছু দিতে পারেন বা পারছেন?

❖ সাহিত্য ষিয়ে নানা জনের নানা মত আছে এবং আমার মনে হয় এক্ষেত্রেও 'যত মত তত পথ' বাণীটিই সত্য। যে ভাবেই ভাবুক না প্রতিটি সাহিত্যের অনন্য - লক্ষ্য এক শিল্পসম্পূর্ণতা। সমাজকে কিছু দেওয়ার বাসনা আবেগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতা রচনার প্রাথমিক প্রেরণা হতেই পারে, কিন্তু সেই কবিতার একমুখী লক্ষ্য শিল্পসম্পূর্ণতা, একটা পরিপূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠা। বস্তুত কবির মূল দায়িত্ব সমাজের কাছে নয়, কবিতার কাছে। সব কিছুই কবিতার উপকরণ হতে পারে, যেমন—সমাজ সচেতনতা, সেইরকম প্রেম, সেইরকম ঈশ্বর একইরকমভাবে মানুষের রক্তিম আবেগগুলিও। কিন্তু বিষয় যা কিছুই হোক না, কবিতার অনন্য অভিলাষ একটি সম্পূর্ণ কবিতা হওয়ার দিকে। সমাজকে কিছু দেওয়ার দায়িত্ব কবির নয়, কবির একমাত্র দায়িত্ব কবিতার কাছে।

১২। ৩০০ বছরের কলকাতা নিয়ে মাতামাতি আপনার কেমন লাগছে? বানতলার পরিপ্রেক্ষিতে ৩০০ বছরের পূর্বের জঙ্গল ফিরে আসছে যদি বলি, তবে কি ভুল বলা হবে? কবি হিসেবে আপনার মনে কোন বিক্ষোভ হয়? তার প্রকাশ কী?

৩০০ বছরের কলকাতা নিয়ে যাবতীয় মাতামাতিই শিশুসুলভ তাৎপর্যহীন পশুশ্রম, খুকুদের পুতুলের বিবাহ দেবার সমারোহের কথা মনে পড়ে কিংবা জমিদারবাবুর, মার্জার শাবকের অন্নপ্রাশন উৎসবের জাঁকজমক, বানতলার ঘটনার আবার আমাদের আদিম জঙ্গলের রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বললেই কর্তব্য শেষ হয় না। প্রথমত বুঝতে হবে কেন এই ঘটনা

ঘটল— এটা কি তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়তাড়িত কোনো আবেগের প্রতিক্রিয়া — নাকি এর প্রস্তুতি দীর্ঘদিন যুক্তিবাদী মন নিয়ে সব ঘটনাকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে— সত্যকে জানতে হবে এবং মনে রাখতে হবে— ‘‘শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখে মনে।”

১৩। জন্মদিনে পায়েস খাওয়া আর কলকাতাতে সব সময় থাকা — এ দুটি একান্ত ভালোবাসার কথা শুনেছি — এ ছাড়া আর কোন ভালোবাসা?

❖ ভালোবাসার কি কোন শেষ আছে, ভালোলাগার। ছাদে কার্নিশে গরীব শীর্ণ গাছটায় বাদামী রঙের ফুল ফুটেছে ওই ওই দেখো দেয়াল বেয়ে কত শ্লথ কত মন্ত এগিয়ে চলেছে রোদ্দুরের সোনালী বল, এই এইবার ধরে ফেলবে অঅলামারীর কাঁচ। কোনো ঘটনা আর ঘটবে না জেনেও সন্ধ্যার ভিজে -ভিজে অন্ধকারে সেই জারুল গাছটার নিচে আর একবার দাঁড়ান। ভালোলাগার কি কোনো শে, আছে অন্তহীন শান্তির। তারের ওপর এই যে সবুজ ঠোঁটের পাখিটা এসে বসল ওই সেই তিন বছর আগের দেখা পাখিটা নয়? কাকে বলব, কাকে জিজ্ঞেস করব, বলো বলো তো সেই পাখিটা নয়! আজ অনেকদিন পর ফিরে এসেছে! জন্মদিনের পায়েসের চাইতেও অনেক বেশি মনে পড়ে হরির লুটের কুড়িয়ে পাওয়া সেই একটি বাতাসা, কিংবা প্যাকেট শেষ হয়ে যাবার পর কোলের কাছ থেকে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া ঝলমল একটি বাদামের দানা।

১৪। নতুন কবিদের কিছু উপদেশ...

❖ উপদেশ দেবার যোগ্যতা আমার নেই।

[অক্টোবর ’৯০/ জলপ্রপাত ৪০ সংখ্যা থেকে]